

বাংলাদেশের নদ-নদী

ভূমিকা : সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশের বুক চিরে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। এজন্য আমাদের দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। বাংলার মানুষের জীবন ও সমাজপ্রবাহের সঙ্গে নদ-নদীর প্রবাহ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা নদীই যেন এদেশের প্রাণ। মায়ের অকৃত্রিম স্নেহে নদ-নদীগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে এদেশের জনপদগুলোকে। তাই বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার জন্য নদ-নদীর ভূমিকা অপরিহার্য।

ঐতিহাসিক বিকাশে নদ-নদীর গুরুত্ব : প্রাকৃতিক নিয়মেই নদ-নদীর সৃষ্টি হয়। অতীতে এই বিভিন্ন নদ-নদীর চারপাশ দিয়েই গড়ে ওঠে বিভিন্ন মানুষের জনপদ। চীন দেশে ইয়াং সিকিইয়াং, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস মিশরের নীলনদ, পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সিন্ধু নদ; ভারতের বিভিন্ন নগর সভ্যতায় গঙ্গা এবং বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ের পুন্ড্র নগরীতে করতোয়া নদী এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। মানুষের সভ্যতার ভূমিকা ও বিকাশে নদ-নদীগুলোর অবদান অপরিমিত।

বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহ : পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ বলা হয় বাংলাদেশকে। মাকড়সার জালের মতো এদেশের বুকে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী, গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীসহ মোট সংখ্যা প্রায় ২৩০। নিচে প্রধান প্রধান নদ-নদী পরিচয় তুলে ধরা হলো :

পদ্মা : পদ্মা নদীকে বাংলাদেশের প্রধান নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত এর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে। পরে ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এসে পদ্মা নাম ধারণ করে অবশেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তবে ভারতে এর

অংশবিশেষের নাম গঙ্গা। এই পদ্মা নদী গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সাথে এবং চাঁদপুরে এসে মেঘনার সাথে যুক্ত হয়েছে। পদ্মার স্রোতের আছে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। এজন্য ‘রাফুসে’, ‘সর্বনাশা’, ‘কীর্তিনাশা’ একাধিক নাম জুটেছে পদ্মার। তবুও পদ্মার প্রবাহ বাংলাদেশকে রূপে গুনে সম্পদে করেছে ঐশ্বর্যময়।

মেঘনা : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী হলো মেঘনা। এটি আসামের নাগা-মনিপুর থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মেঘনা ভৈরব বাজারে মিলিত হয়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে এবং চাঁদপুরে মিলিত হয়েছে পদ্মার সাথে। এরপর মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মনু, তিতাস, গোমতী বাংলার এগুলো মেঘনার উপনদী।

যমুনা : হিমালয় পর্বত থেকে যমুনা নদীর উৎপত্তি। এটি বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী হিসেবে পরিচিত। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের এক শাখা যমুনা নামে বের হয়ে বাহাদুরাবাদ - সিরাজগঞ্জ হয়ে গোয়ালন্দের কাছে মিলিত হয়েছে পদ্মা নদীর সঙ্গে। ধরলা, ধলেশ্বরী, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই ইত্যাদি যমুনার শাখা নদী। এই নদীর উপরেই নির্মিত হয়েছে ‘যমুনা বহুমুখী সেতু।’

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে এটি তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রংপুর জেলার কাছে এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মূলত এর দুটি শাখা। এক শাখা হলো যমুনা নদী এবং অপর শাখাটির নাম হচ্ছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ময়মনসিংহের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভৈরব বাজারে এসে মিলিত হয়েছে মেঘনা নদীর সঙ্গে।

কর্ণফুলী : বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী কর্ণফুলীর উৎপত্তি হয়েছে লুসাই পাহাড় থেকে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে

বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হলো : কামালং বোয়ালখালী ও হালদা।

অন্যান্য নদীসমূহ : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র কর্ণফুলীসহ বাংলাদেশের আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী রয়েছে। যেমন: শীতলক্ষ্যা, ফেনী, সাঙ্গু, সুরমা, কুশিয়ারা, ডাকাতিয়া, মধুমতি, গড়াই, রূপসা, বুড়িগঙ্গা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী।

উর্বরতায় নদ-নদীর ভূমিকা : উর্বর ভূমি হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীতে বিশেষভাবে পরিচিত। আর এই উর্বরতা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে এদেশের নদ-নদী। নদীর স্রোতে বয়ে আসা পলি দ্বারা জমি আরো উর্বর হয়। নদ-নদীর দু'ধার দিয়ে তাই নেমে আসে ফসলের বন্যা। শস্য-শ্যামলা বাংলার প্রকৃতি তখন বিশ্বদ্বারে অদ্বিতীয় স্থান দখল করে নেয়।

নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : নদী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য উপাদান। এ নদীগুলো কখনো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, আবার কখনো শান্ত ও অপরূপ সুন্দর। বর্ষা ঋতুতে নদ-নদীগুলো পানিতে থৈ থৈ করে। আর তখন নদীতে মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। জেলে-নৌকাগুলো রাত-দিন ব্যস্ত থাকে। প্রকৃতি যেন তার বিগলিত করুণায় এদেশকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে। নদীর দু'ধারে কাশবন আর ছোট ঘরগুলোকে দেখে যেন মনে হয় কোনো শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। বড় বড় নদীর বুকে ছুটতে থাকে অসংখ্য লঞ্চ, জাহাজ, পালতোলা বড় বড় নৌকা। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এদের চলাচল দেখতে মনে অপূর্ব অনুভূতি হয়। নদীতীরে গোধূলির সূর্য অস্ত যায়, তীরের সারি-সারি গাছগুলো নীরবে ঘুমিয়ে পড়ে। পাখিরা তাদের নিজ নিজ ঘরে ফেরে, সেই সাথে নেমে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর জেলেদের নৌকাগুলোতে মিটমিট করে আলো জ্বলে ওঠে। সবমিলিয়ে যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। পৃথিবীর আর কোথাও নদ-নদীর এমন চোখ জোড়ানো, মন মাতানো দৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই কবিকণ্ঠে বেজে ওঠে -

‘এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদীর তটে,
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়।
এ আমার দেশ, এ আমার প্রেম,
কত আনন্দ বেদনার মিলন বিরহ সংকটে।’

নদ-নদী ও মানুষের জীবন : বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলেই কোনো না কোনো নদ বা নদী রয়েছে। এই নদ-নদীর সাথে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক। মৎস্যজীবী বা জেলে সম্প্রদায় নদীতে মাছ ধরতে তাদের বংশানুক্রমিক পেশাকে বজায় রাখে। বাংলাদেশের রূপালী ইলিশের কদর সারা পৃথিবী জুড়ে। এই মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেই সাথে অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে এই বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে।

সাহিত্যে নদ-নদীর প্রভাব : কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের রচনার অনেক উপাদান ও অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন এ সকল নদ-নদীগুলোর কাছ থেকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কপোতাক্ষ নদ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী, চঞ্চলা প্রভৃতি রচনায় কবিমনের সাথে নদ-নদীর মিলন ঘটেছে। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ প্রভৃতি উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবনকথা। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস তাঁর ‘নদী’ কবিতায় এভাবেই তার বক্তব্য করেছেন—

নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

তুমি যেন ছোটো মেয়ে—আমার সে ছোটো মেয়ে:

যত দূর যাই আমি—হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,

তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি: আমারি নিজের শিশু সারাদিন

নিজ মনে কথা কয় (যেন)।

সংস্কৃতিতে নদ-নদীর প্রভাব : মানুষের জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার সংস্কৃতিচর্চায়। আর সেই সংস্কৃতির মধ্যেও নদ-নদীর প্রভাব অনস্বীকার্য। সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র এমনকি বিভিন্ন পালাগান বা উপাখ্যানেও নদ-নদী সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করা হয়। ভাটিয়ালি সংগীতকে নদী থেকে যেমন আলাদা করা যাবে না, তেমনি নৌকাবাইচ, জারি গান, সারি গান ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নদীর দৃশ্য ছাড়া চলচ্চিত্র বা নাটকের সৌন্দর্যই ফুটে ওঠে না।

নদ-নদী ও বিনোদন : নদ-নদী মানুষকে আকৃষ্ট করে তোলে। তাই মানুষ একটু উদার পরিবেশ পাওয়ার আশায় ছুটে যায় নদী তীরে। সেখানে নিরিবিলা সময় অতিবাহিত করতে ভালোবাসেন এবং প্রত্যক্ষ করেন নদীর বুকে জীবনপ্রবাহ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। নৌকাভ্রমণ মানুষের বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম।

উপকারিতা : জীবদেহে রক্তবাহী শিরার মতোই নদ-নদীগুলোও বাংলাদেশের প্রাণরসবাহী শিরা উপশিরাস্বরূপ। বর্ষাকালে নদী প্রবাহিত পলি এদেশের জমিগুলোর উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আর সেই জমিতে কৃষক সোনার ফসল ফলায়। শুধু তাই নয় নদী অন্যভাবেও আমাদের উপকার করে। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের তুলনায় নৌ যোগাযোগের সুযোগ বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবেও নদীকে ভাবা যায়।

অপকারিতা : প্রকৃতির রুদ্ররোষের নদী কখনো মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষাকালে বন্যা হয়ে নদীর স্রোত লোকালয়ে প্রবেশ করে যার ফলে ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেত সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীতে ঝড় উঠলে নৌকাডুবি হয়ে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। আবার, ভাঙ্গনের ফলের তীরবর্তী

অনেক ঘরবাড়ি, চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু নদীর এই উন্মত্ততা প্রকৃতির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের নাব্যতা দিন দিন কমতে শুরু করেছে। কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চক্রান্তে নদী ভরাট করা হচ্ছে। আবার নদীর পরিষ্কার পানিতে অবৈধভাবে কল-কারখানার বর্জ্য ফালানোর ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। মানবসৃষ্ট এরকম বিভিন্ন উপায়ে আজ এদেশের নদীর স্রোত কমে যাচ্ছে, এমনকি নদীর গতিমুখ পরিবর্তন হচ্ছে, পানি দূষণ বাড়ছে সর্বোপরি নদ-নদীগুলো ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতা : বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোকে ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলে জনসচেতনতা অতি জরুরি। ভরাট নদী খননের ব্যবস্থা করা, অবৈধ নদী দখল বন্ধ করা, নদীতে বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্ক্ষেপ আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ করা সর্বোপরি মানুষের জীবনে নদ-নদীর গুরুত্ব সম্পর্কে একমাত্র জনসচেতনতাই পারে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সমুল্লত রাখতে।

উপসংহার : নদীমাতৃক বাংলাদেশের অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাখেত্র হলো নদ-নদী। আর সেই নদ-নদীর সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নদী আপন বন্ধুর মতোই অবদান রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় নদ-নদীর ভূমিকা অপরিণীম। সুখ-দুঃখ, বিপদে-আনন্দ মুহূর্তে নদী আমাদের সঙ্গী হয়ে পাশে অবস্থান করে। তাই সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্যে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া নদ-নদীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনে সবাইকে এগিয়ে আসা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

